

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মৈমনসিংহ গীতিকায় লোকসংস্কৃতির উপাদান

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.5
Pages	৫৭-৬৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৈমনসিংহ গীতিকায় লোকসংস্কৃতির উপাদান

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ*

সার-সংক্ষেপ : *মৈমনসিংহ গীতিকা* লোক-সাহিত্যের সংকলন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত বহু সংখ্যক পালাগান শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। পালাগানগুলিতে সেকালের সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, ধর্মীয় আচার ও প্রেম-বিষয়ক নানা তথ্য বর্ণিত হয়েছে। *মৈয়মনসিংহ গীতিকায়* লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির ঠিকানা সন্ধানে এ গ্রন্থ সঞ্চার করতে পারে আলোকিত দিক-নির্দেশনা। বর্তমান প্রবন্ধে, লোকসংস্কৃতির উপাদান অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বাঙালির জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গ্রাম-বাংলার অবহেলিত অর্ধ-অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, অথবা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নয়, এমন স্বভাব-কবিগণ লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির জনক। মানুষের মুখে-মুখে যুগের পর যুগ এ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা চলে আসছে। বর্তমানকালের আকাশসংস্কৃতি ও আধুনিক নগর সভ্যতার কারণে সেকালের গীত-গাথা অনেকাংশে হারিয়ে গেছে। লোকসংস্কৃতি একটি জাতির সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে। "লোক-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান লোক-সংস্কার ও লোক-বিশ্বাস" (ঘোষ, ২০১২ : ৮০)। লোক গাথার মধ্যেই নিহিত আছে বাঙালির আদি সংস্কৃতির ছাপ। লোকপুরাণ, খনার বচন, পালাগান, প্রবাদ ও লোক-সঙ্গীতের মধ্যে জাতির বিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্পষ্ট বার্তা নিহিত থাকে। মানব সভ্যতার সকল স্তরেই প্রবাদ ও লোক-সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায় (আহসান, ১৯৯৪ : ১০৭)। লোক-কাহিনী, লোক-সঙ্গীত, পালাগান প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে চলে এসেছে (আহসান, ১৯৯৪ : ১০৯)। একই সাথে ঐসব লোক-সঙ্গীত অথবা পালাগানে সেকালের সাংস্কৃতিক বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে বিশেষ কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলার জনপদ পৃথক ছিল। শশাঙ্কের রাজত্বকালে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পাল সম্রাটেরা ও সেন রাজারা পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদকে একটি দেশে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, রাঢ়, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বরেন্দ্র, বঙ্গ, হরিকেল, সমতটের পৃথক সত্তা বজায় ছিল (রায়, ১৪০০ : ৬৯৬)।

*সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

বাংলা লোক-সাহিত্যের বেশ কিছু উপকরণ সম্ভবত, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। সমাজের নিম্নস্তরে কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মনসা চণ্ডী ও ধর্ম-দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। লোক-সাহিত্য প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন বাংলার মধ্য দিয়েই এসেছিল (সেন, ১৯৯১ : ৮২-৮৩)। চতুর্দশ শতক হতে মধ্যযুগের আরম্ভ গণ্য করা যেতে পারে। এই সময় সমস্ত বাংলাদেশ মুসলিম অধিকারের কাল। হিন্দু সেনরাজগণ সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যেতর ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে সম্ভবত তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। সেকালে বাংলাদেশ, আসাম ও উড়িষ্যায় জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের চর্চা ছিল। সংস্কৃতির ঐক্যের কারণে এসব অঞ্চলে লোক-সাহিত্য ও ছন্দের ঐক্য দেখা যায়। খনার বচন, ডাকের বচন এবং ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের আদি কাব্য এই কালে রচিত (শহীদুল্লাহ্, ১৯৯৫ : ১০-১১)। ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত ব্যক্তিজীবন-অভীপ্সায় উজ্জীবিত, স্বাধীনমনস্ক, নারী প্রাধান্য বিশিষ্ট, আদিবাসী সংস্কৃতি-প্রভাবিত, এবং এক বৈশিষ্ট্যময় প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে ময়মনসিংহ গীতিকাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে (হক, ১৯৯০ : ২৭১)। *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালাগুলোর কোনো কোনো পালা সম্ভবত, চণ্ডীদাসেরও পূর্বে রচিত। তবে অধিকাংশই পরবর্তীকালে রচিত। পালাগানের রচয়িতাগণ বৈষ্ণব কবিদের কোনো সন্ধান রাখতেন না। তাঁরা নায়ক-নায়িকার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পালা রচনা করেছিলেন। পালাগানের রচয়িতাদের মধ্যে বই-পড়া বিদ্যার কোনো চাকচিক্য নেই (সেন, ২০০০ : ৭৪-৭৫)। বিষয়গত দিক থেকে প্রণয়ভাবনা এবং সুরের দিক থেকে সংগীতময়তা ময়মনসিংহ গীতিকাসমূহের মৌল উপজীব্য (হক, ১৯৯০ : ৯)। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী কিংবা ধর্মকেন্দ্রিক না হয়ে *মৈয়মনসিংহ গীতিকার* পালাগুলিতে মানবধর্মের জয়গান প্রাধান্য পেয়েছে। এজন্য এই পালাগুলি হয়ে উঠেছে সর্বকালের। *মৈয়মনসিংহ গীতিকার* পালাগুলিতে মানব স্বভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম এখানে শিথিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে গাথাগুলির উদ্ভব ও বিকাশ। নারীর স্বাধীন সত্তা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত (চৌধুরী, ২০০৪ : ১১৫)।

দেশাচার, লোকপ্রথা, প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা, যা বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে দেখে ও শুনে লাভ করে, তাই লোক-সংস্কৃতির উপাদান (আহমদ, ২০০১ : ৩১)। লোক-সংস্কৃতির মধ্যে জাতির বংশ-পরম্পরার সাংস্কৃতিক ধারা সংরক্ষিত থাকে। "লোক-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, লোক-সঙ্গীত, লোক ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচন। লোকায়ত মানুষের মর্মলোকের কথা সবচেয়ে গভীরভাবে ব্যক্ত করে লোক-সঙ্গীতে" (ঘোষ, ২০১২ : ৮৩)। *মৈমনসিংহ গীতিকা* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "মৈমনসিংহ থেকে যেসব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। ... মানুষের চিরকালের সুখ-দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা"। বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত বহুসংখ্যক পালাগান শ্রী দীনেশচন্দ্র

সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) সম্পাদনা করে, *মৈমনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ-গীতিকা* শিরোনামায় চার খণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। পালাগানগুলির অধিকাংশ নেত্রকোনার চন্দ্রকুমার দে[১] সংগ্রহ করেন। প্রায় একযুগের সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত মোট ২১টি পালার মধ্যে ১০টি *মৈমনসিংহ গীতিকার* প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং দু-একটি বাদে বাকিগুলি *পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়* সংকলিত হয় (সিরাজুল ২০০৩ : ৩৭৩-৭৪)। *মৈমনসিংহ গীতিকার* দশটি পালার মধ্যে নয়টিই প্রেমমূলক, একটি দস্যুতামূলক। প্রেমগাথার নায়ক-নায়িকারা বর্ণ-বিত্ত-কুল-ধর্মের দিক থেকে কেউ সমস্তরের, কেউ-বা অসমস্তরের। নায়ক-নায়িকার প্রেমে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামন্তপতি, তার প্রতিনিধি, বিত্তশালী ও অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তির রূপতৃষ্ণা, প্রণয়বাসনা, কামপ্রবৃত্তি ইত্যাদির কথা আছে (সিরাজুল ২০০৩ : ২৩৫)। গাথাগুলিতে আছে, বিবাহপূর্ব প্রেম, দাম্পত্য প্রেম ও পরকিয়া প্রেম বিষয়ক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নানারূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং মিলন-বিরহের চিত্র (সিরাজুল ২০০৩ : ৩৭৩-৭৪)। উল্লেখযোগ্য, *মৈমনসিংহ গীতিকায়* প্রেমের পাশাপাশি লোক-সংস্কৃতির বিষয়ও প্রতিফলিত হয়েছে।

মানবজীবন সংস্কৃতি-নির্ভর। সংস্কৃতি সমাজ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার অপূর্ব মিল লক্ষ করা যায়। ব্যক্তির অসহায়ত্ব, নিয়তিনিষ্ঠা, পোশাক-আশাক, রীতি-রেওয়াজ, বিশ্বাস, সংস্কার, ভাবনা-চিন্তা, সুকুমারবৃত্তির চর্চা, ব্রতানুষ্ঠান, আচার-আচরণ, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি বিষয় প্রায় একই সংস্কৃতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই সংস্কৃতির সামগ্রিক উপাদান *মৈমনসিংহ গীতিকায়* লক্ষ করা যায়। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন। *মৈমনসিংহ গীতিকা* এই জীবনেরই অর্থবহ পরিচিতি।

২

সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের মধ্যেই লোক-সংস্কৃতি নিহিত এবং একই সাথে বাংলা সাহিত্যে তা প্রতিফলিত। *মৈয়মনসিংহ গীতিকার* ইংরেজি অনুবাদ পড়ে রোমা রালাঁর মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতও লিখেছিলেন, এই শীত প্রধান দেশে *মৈমনসিংহ গীতিকার* চরিত্রগুলি চিরন্তন মানবতার লীলাখেলা দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের *ধর্মমঙ্গল*, *মনসামঙ্গল*, *রায়মঙ্গল* এসবের পর ষোড়শ শতকের গাথাসাহিত্যগুলি চিরন্তন মানবিক রসে পরিপূর্ণ (সিদ্দিকী, ১৯৯৫ : ১৯)। সেকালের উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত সকলের পারস্পরিক স্বভাব-চরিত্র, কৃষ্টি-সংস্কৃতি *মৈমনসিংহ গীতিকায়* পাওয়া যায় (খাতুন, ২০০১ : ৩৩)। সমাজে সংঘটিত বাস্তব ঘটনা কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত লোক-সংস্কৃতি মানুষের মনে আনন্দ-বেদনার শিহরণ জাগিয়ে তোলে। *মৈমনসিংহ গীতিকায়* বিধৃত সমাজচিত্রে এ বিষয়টি লক্ষণীয়।

মৈমনসিংহ গীতিকায় স্থান পাওয়া, পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-ময়মনসিংহের কোনো কোনো যথার্থ ঘটনা অবলম্বনে রচিত (সেন, ১৯৯৫ : খ ৪৬)।

৩

মৈমনসিংহ গীতিকায় এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে সামাজিক উৎসব; যেমন, দুর্গাপূজা। এই পূজা হিন্দু সমাজের এক বড় ধর্মীয় উৎসব। পূজার এই উৎসবের পিছনে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনি। শাস্ত্রে আছে, দুর্গম নামক অসুরকে বধ করায় মায়ের নাম দুর্গা। দুর্গম অসুরের কাজ ছিল জীবকে দুর্গতি দেওয়া। সেই দুর্গমকে বধ করে যিনি জীবজগতকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করেন, তিনিই মা দুর্গা (হক, ১৯৯৫ : ১৫)। পূজা-পার্বণও লোক-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান (ঘোষ, ২০১২ : ৮৩)। ধর্মীয় এই সংস্কৃতির কথা *মৈমনসিংহ গীতিকায়* 'মহুয়া', 'কমলা', 'মলুয়া', 'দেওয়ান ভাবনা', 'চন্দ্রাবতী', 'কঙ্ক ও লীলা' প্রভৃতি পালাতে লক্ষণীয়। '*কমলা*' পালায় মইষাল অপরূপ রূপবতী অভাগী কমলাকে মা দুর্গা ভেবে তার পা জড়িয়ে ধরে বলে :

> অপরূপ রূপ দেখি মইষাল ভাবিল।
> লক্ষ্মী বুঝি ছলিবারে আমারে আইল ॥
> ভাল পূজা দিবাম মাগো আইস আমার ঘরে।
> অচলা হইয়া থাকবা আমার না ঘরে॥
> ধনে পুত্রে বর দেও বারুক সম্পদ।
> তোমার কৃপায় ঘুচুক বালাই আপদ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ১৪৭)

দুর্গাপূজায় এই বিশ্বাসলব্ধ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আজো বাংলার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মনে প্রাপ্তির আশা জাগায়। উল্লেখযোগ্য, দুর্গাপূজা বাঙালিরই উৎসব এবং এর উদ্ভব বাংলাদেশেই হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। দুর্গাপূজা ছাড়াও কালী পূজা (কমলা, কঙ্ক ও লীলা), মনসা পূজা (কমলা, দেওয়ান ভাবনা, মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা), কার্তিক পূজা (কমলা, মলুয়া), শিব পূজা (চন্দ্রাবতী), শ্যামা ও বনদুর্গার পূজা (চন্দ্রাবতী), লক্ষ্মী পূজা (কমলা, কাজল রেখা, মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা) ইত্যাদি পালায় বিধৃত হয়েছে। শিব আদিতে অনার্য দেবতা। আদিম মানবের প্রধান খাদ্য ছিল পশুর মাংস। পশু শিকারে বেরিয়ে অনেক সময় পুরুষদের ফিরতে দেরি হতো। তখন মহিলা ও শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল-মূল খেয়ে প্রাণ ধারণ করতো। সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া মেয়েদের জানা ছিল। তারা ভূমিকে মা হিসেবে মনে করে পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ ষষ্ঠি বানিয়ে শষ্য উৎপাদন করলো। লিঙ্গ, লাঙ্গুল ও লাঙ্গল এই তিনটা শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন। প্রথম ফসল তোলার পর নবান্ন উৎসবে জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবী পূজা। এই আদিম উৎসব থেকে উদ্ভব হয়েছিল, শিব ও শিবানীর কল্পনা। শিবানী যে কৃষির দেবতা তা প্রকাশ পায় তার অন্নপূর্ণা, শাকম্বরী ইত্যাদি নাম থেকে (সুর, ১৯৯১ : ১২৫-২৬)।

মুসলমানদের ধর্মীয় আচারও বিভিন্ন পালায় লক্ষণীয়। যেমন *'মহুয়া'* পালায় :

পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উর্দিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান ॥
সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ৩)

'দেওয়ানা মদিনা' পালায়ও কবরের কথা, আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় এবং পাপ-পুণ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। স্বামীর জন্য অপেক্ষার পালা শেষ করে, মদিনা কবরবাসী হয়েছে। দুলাল ফিরে এসে যখন মদিনার কবর দেখল, তখন সে বেদনায় কাতর হয়ে উঠল। যেমন:

দুলাল পড়িয়া কান্দে কয়বর উপরে
হায় গো আল্লাজী পড়লাম কি পাপের ফেরে ॥
নিজ হাতে বধ করলাম জননার পরাণ।
এই দুনিয়াতে মোর নাহি আর থান। (সেন, ১৯৯৫ : ৩৮৯)

ওস্তাদ-গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপটের একটি বিশেষ দিক। গীতিকার কবিগণ গীত বন্দনায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে মেনে চলেছেন এবং সেই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে গীতিকাগুলোকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন। 'কাজলরেখা' পালায় :

এই সভায় গাইতে গান কি শক্তি আমার ॥
দশ জনায় ধইরাছুইন্ মোরে না দেখি উপায়।
তবে যে গাইবাম গান উস্তাদের কিরপায় ॥
উস্তাদের চরণে আমার শতেক পন্নাম। (সেন, ১৯৯৫ : ৩১৯)

বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে এক শ্রেণির মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। জীবিকা অর্জনের এই ধারা সবকালেই বিদ্যমান ছিল। এখনও গ্রাম বাংলায় মরমী গান, পরকালের প্রতি ভীতি প্রদর্শিত বিভিন্ন গান গেয়ে কিছু মানুষ রুটি-রুজির সংস্থান করে থাকে। *মৈমনসিংহ গীতিকাতেও* এর সত্যতা পাওয়া যায়। শিবু গাইনের বন্দনার ভাষায় :

গাহনা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী।
সভার প্রসাদে কিছু পাই চাউল কড়ি ॥
ইনাম বক্‌সিস্ কিচু সভাপদে চাই।
কর্ম্ম কর্ত্তার কাছে একখান নববস্ত্র পাই ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ২৬৮)

"লোক খেলাধুলা লোক-সংস্কৃতির বিশিষ্ট উপাদান" (ঘোষ, ২০১২ : ১৬৪)। সার্কাস খেলা একসময় বাংলাদেশের মানুষের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। কোথাও কোনো সার্কাস দল এলে অনেক দূর থেকে মানুষ সার্কাস খেলা দেখতে আসতো। ভাল খেলা দেখালে অনেকে বকশিসও দিত। 'মহুয়া' পালায় এই বিষয়টি লক্ষণীয়। হোমরা বেদের চুরি করা কন্যা 'মহুয়া' যখন বামনকান্দা গ্রামে গিয়ে নদ্যার ঠাকুরের বাড়িতে সার্কাস দেখায়, তখন আনন্দিত হয়ে নদ্যার ঠাকুর বকশিস প্রদান করে। যেমন :

হাজার টেকার শাল দিল আরো টেকা কড়ি।
বসত করতে হুমড়া বাইদ্যা চাইল একখানা বাড়ী ॥
ডাইল দিল চাইল দিল রসুই কইর‍্যা খাইও।
নতুন বাড়ীত খাইয়া তোম্‌রা সুখে নিদ্রা যাইও ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ৮)

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে কবিরাজি, ভেষজ চিকিৎসা চলে আসছে। রোগের প্রতিষেধক হিসেবে তন্ত্র-মন্ত্র, তেল পড়া, পানি পড়া, বনের গাছ-গাছালি, লতা-পাতা ইত্যাদির ব্যবহার ছিল। বর্তমানকালেও লোক-চিকিৎসার প্রতি মানুষের বিশ্বাসের নানামাত্রিক অনুষঙ্গ আমাদের নজরে আসে। *মৈয়মনসিংহ গীতিকায়* লোক-চিকিৎসার চিত্র :

বনে আছে গাছের পাতা তুইল্লা দিবাম আমি।
এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পরাণী ॥
দারুণ আকাল্যা জ্বর হাড়ে লাগ্যা আছে।
পরাণে বাঁচিয়া আছে মইর‍্যা না সে গেছে ॥
শ্বাসেতে ধরিয়া পাতা আন নদীর পানি।
এই মন্ত্রে বাঁচাইব তাহার পরাণি ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ৩২)

মধ্যযুগে সন্ন্যাসীরা ওষধি চিকিৎসা করতেন। এখন আধুনিক অনেক ঔষধও ভেষজ গাছ-গাছালি থেকে তৈরি হচ্ছে। গোলাপ জল চক্ষু স্নিগ্ধকারক ঔষধ হিসেবে প্রচলিত ছিল। এখনও ধনেপাতা, গাঁদাল, পুদিনা, হেলঞ্চ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। পেটের অসুখের জন্য থানকুনি পাতার রস, ঘুমের জন্য সুষনি শাক, মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য ধৃতকুমারী, সর্দি কাশিতে তুলসীপাতা বা আদার রস কিংবা বাসক পাতার ব্যবহার বর্তমানকালেও দেখা যায় (দাস, ২০০৪ : ৪৩৮-৩৯)। এ সবই বাংলার লোক-সংস্কৃতির উপাদান। 'মহুয়া' পালায়, ভক্ত সন্ন্যাসী যে গাছান্ত ওষুধ ব্যবহারে লোকচিকিৎসা বিদ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত করে গেছে, তার মূল্যও কম নয় এবং এ ধারা বাঙালি সমাজে আজও প্রচলিত (রহমান, ২০০৩ : ৩৪)।

কলসী কাঁখে জল আনতে যাওয়া বাঙালি নারীর চিরন্তন সাংস্কৃতিক চিত্র। পুকুর কিংবা নদীর ঘাটে প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃত আলাপচারিতার দৃশ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক

ছিল। এমন দৃশ্য 'মহুয়া', 'কমলা' 'চন্দ্রাবতী' ইত্যাদি পালায়ও বিধৃত। উল্লেখযোগ্য, নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান যানবাহন নৌকার কথা উল্লেখ করা যায়। 'মহুয়া', 'দেওয়ান ভাবনা', 'রূপবতী' প্রভৃতি পালায় পানসি নৌকার উপস্থিতি লক্ষণীয়। রূপবতীতে :

কানা চইতা উভুতিয়া তারা দুইটী ভাই।
পান্সী সাজাইতে তারা পাইল ফরমাই ॥
ষোল দাঁড় জুইত করে আরও তুলে পাল।
পান্সীতে ভরিয়া রাজা তুলে মালামাল ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ২৪৩)

পাল তোলা পানসী নৌকার দৃশ্য বাংলাদেশের অপরূপ দৃশ্যের একটি এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশে ৫০/৬০ বছর পূর্বে নৌকা যানবাহন হিসেবে অপরিহার্য ছিল। বাংলার লোক-সংস্কৃতির এ উপাদান বিদেশি পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে আছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে অল্প বয়সেই মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। এ রীতি বর্তমানকালে একেবারেই অনুপস্থিত তা বলা যায় না। এই রীতি গীতিকার 'কাজলরেখা', 'দেওয়ান ভাবনা' প্রভৃতি পালায় লক্ষ করা যায়। যেমন– 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় :

দশ বচ্ছর গিয়া সুনাইগো এগারতে পড়ে।
কন্যার যৈবন দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে ॥
এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী।
কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ১৭৬)

মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালাতে কানে ঝুমকা, নাকে বলাকা, গলায় হাসুলি, পায়ে গুজরি, হাতে বাজু, মাথায় সিঁথিপাটি পরার কথা রয়েছে। এগুলো বাংলার নারীসমাজে অতি পরিচিত ব্যবহার্য অলংকার। সোনা, রূপা ও ধাতুজ অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার বাঙালি সমাজে বর্তমান। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে মেয়েরা সৌন্দর্যচর্চায় সোনা, রূপার পাশাপাশি বনের ফুলকেও অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েরা কানফুল, নাকফুল, গলার হার, হাতে বাজু, পায়ের মল, কোমরের বিছা, চুরি, নাকের নোলক, আংটি ইত্যাদি ব্যবহার করত। বিবাহিত হিন্দু সধবা মেয়েরা মাথায় সিঁদুর পরত। সোনা, রূপা ছাড়াও মেয়েরা মণি, মতি, মুক্তা, হিরা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করত। গীতিকায় বিধৃত পালা থেকে প্রতীয়মান হয়, তৎকালীন সমাজের নারীরা শাড়ি ব্যবহার করত। মেয়েরা লম্বা চুল রাখত এবং তা বেণী করে বিভিন্ন ফুল দ্বারা শোভিত করত ও সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার করত। তারা চোখে কাজল, কপালে টিপ ব্যবহার করত (খাতুন, ২০০১ : ৩৮-৩৯)।

শুধু সাজ-সজ্জাই নয়, বিয়েতে বধূকে পান-ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়ার রেওয়াজও লক্ষ করা যায়। 'মলুয়া' পালায়, "পান ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে" (সেন, ১৯৯৫: ৯৬)। এছাড়াও বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর-কন্যার দাম্পত্য জীবনের সুখের জন্য সোহাগ মাগার কথা রয়েছে এবং পাল্কীতে চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার কথা রয়েছে। ৫০/৬০ বছর পূর্বে বাংলাদেশের লোকযানের মধ্যে পাল্কি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। বিয়ের সময় পাল্কিতে চড়িয়ে কনে আনা এদেশের লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ (ঘোষ, ২০১২ : ১৬৪)। সেকালে পাল্কির প্রচলন ছিল ব্যাপক। বিশেষত অন্তঃপুরিকাদের যাতায়াতে পাল্কিই অধিক ব্যবহৃত হতো। অসহায় কমলা মাতাকে সঙ্গে নিয়ে পাল্কিতে চড়ে মাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। "পাল্কী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী" (সেন, ১৯৯৫ : ১৬০)।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কিছু মানত করা এটিও বাঙালি সংস্কৃতির উপাদান। গীতিকার অনেক স্থানেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানত করতে দেখা যায়। যেমন, 'মহুয়া' পালায় নদ্যার ঠাকুরের গলায় কাঁটা ফুটলে মহুয়াকে মানত করতে দেখা যায় :

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাঁটা।
বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ৩৫)

বাংলার সমাজ-জীবনে আজও বিবাহের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুষ্টিবিচার লক্ষণীয়। *মৈমনসিংহ গীতিকায়* 'চন্দ্রাবতী' ও 'দস্যু কেনারামের' পালায় এই কুষ্টি বিচার পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বিয়েতে জয় জয়কার শব্দ, শাস্ত্র পাঠ, গীত-গাওয়া, গণনা করে শুভদিন নির্বাচন এবং হিন্দু রীতিতে বাদ্য বাজার বিশেষ প্রচলন ছিল। 'কমলা', 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' পালাতে এই বাদ্য-বাজন লক্ষ করা যায়। 'মলুয়া' পালাতে :

জয়াদি জুকার দেয় কত ঝাড়ে ঝাড়
গীতবাদ্য করে যত নারী চমৎকার ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ৬৬)

বিবাহ উপলক্ষে বাড়িতে লোকের সমাগম ঘটে। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজে; গোয়ালা পাত্রে দই পাতে; আত্মীয়-স্বজন-গুরু-পুরোহিত-পণ্ডিত ব্যক্তির আগমন ঘটে; বিবাহ বাড়ি উজ্জ্বল করে সাজানো হয় (হক, ২০০৩: ৬৭)। বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও বাঁশির প্রসঙ্গ এসে যায়। বাঁশির সুর-ধ্বনি ব্যথাতুর বিরহীকে স্বপ্নীল জগতে নিয়ে যায়। অব্যক্ত চাওয়া-পাওয়ার হৃদয়ানুভূতি বাঁশির সুরের সাথে সাথে সুদূরে মিলিয়ে যায়। বাঁশির সুর কখনো কখনো জাত-কুলের বেড়াজাল ছিন্ন করে প্রেমিক-প্রেমিকাকে কাছে নিয়ে আসে। গীতিকায় বাঁশির সুরের প্রাধান্য লক্ষণীয়। 'মহুয়া' পালায় নদের চাঁদের বাঁশির সুরেও তাই মহুয়াকে রাতের ভয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ অবজ্ঞা করে ছুটে আসতে দেখা যায়। গীতিকার ভাষায় :

বাঁশী শুন্যা সুন্দর কইন্যার ভাঙ্গ্যা গেল ঘুম ॥ ...
আইস্যা দেখে নদ্যার ঠাকুর বাজায় প্রেমের বাঁশী ॥
(সেন, ১৯৯৫ : ১৩-১৪)

বিরহী মনের পুঞ্জিভূত কান্না এ বাঁশির সুরে হালকা হয় (রহমান, ২০০১ : ১১৬)। বাঁশি শুধু প্রেমিকাকেই নয়, কখনো কখনো প্রাকৃতিক নিয়মকেও বশীভূত করে।

কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে।
সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ২৭৬)

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা পল্লি-বাংলার নিসর্গ, ভূ-প্রকৃতি, তরুলতা, ফুল-পাখি, নদ-নদীর বিরহকাতর পরিবেশে মোহন বাঁশির কান্না যেন শাশ্বত বাংলার চির বিরহী রূপটিই উদ্ভাসিত করেছে (রহমান, ২০০১ : ১১৭)। এ বাঁশি নৃত্য-গীত, আনন্দ-বেদনায় একাকার হয়ে লোক-সংস্কৃতির উপাদানে বাংলার মাটি ও মানুষের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

বাংলার বিবাহ-রীতিতে ঘটকের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রে এই বিবাহকার্য ঘটক ছাড়াই হতে দেখা যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ঘটক ছাড়া বিবাহের কথা ভাবাই যেত না। বিবাহ সংঘটনে ঘটকের ভূমিকা মধ্যযুগে সামাজিক আচারে অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল (হক, ১৯৯০ : ৭৬)। 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'দেওয়ান ভাবনা' প্রভৃতি পালায় এই ঘটকালি প্রসংগটি চমৎকারভাবে এসেছে। যেমন, 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় :

এই ঘটক ফির‍্যা গেলরে আর ঘটক আইল।...
এহি মতে আইল ঘটক পরতি মাসে মাসে। (সেন, ১৯৯৫ : ১৭৯)

গীতিকার এই ঘটকালি রীতি বাঙালি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান।

মৈমনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ানা মদিনা' পালায় বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের দাম্পত্য প্রেম ও আটপৌরে প্রাত্যহিকতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে (খালেক, ২০০৩ : ৪৬)। এই প্রেমের আখ্যানে সর্বত্রই মুক্তপ্রেমের জয়গানের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এখানে স্বাধীনভাবে জীবনের সাথী মনোনয়নের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই মুক্তপ্রেমের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পালাগুলোতে দেখা যায়, কোথাও প্রেমিক জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়েছে, কোথাও গৃহধর্ম ত্যাগ করেছে (মহুয়া), কোথাও অভিভাবকের অভিমতের বিরুদ্ধে পতি মনোনয়ন করেছে (ভাবনা), কোথাও ধর্মীয় সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে এসে দাঁড়িয়েছে (চন্দ্রাবতী), কোথাও আবার উচ্চ রাজকার্য পরিত্যাগ করে এসেছে মৃত প্রণয়িনীর সমাধি পাশে (মদিনা) (গুপ্ত, ২০০০ : ১৭৮)। এই নির্ভেজাল প্রেমের বিচিত্র ধারা আজও বাঙালি সমাজে বিদ্যমান।

বাঙালি মায়ের জন্য পুত্র সন্তান বিশেষ চাওয়া-পাওয়ার। গ্রামীণ নিরক্ষর সমাজে এ-কারণেই হয়তো একের পর এক কন্যা সন্তান জন্ম নিলেও পুত্রের আশায় জন্ম নিরোধে সচেষ্ট হতে দেখা যায় না। অবশ্য নিম্ন-বর্গের মধ্যে জন্ম নিরোধ বিষয়ে বিভিন্ন কুসংস্কারও দায়ী বলে মনে করা হয়। এ সত্য গীতিকাতেও বর্ণিত হয়েছে। গীতিকার ভাষায় :

মায় বলে, "পুত তুমি আমার আঁখির তারা।
তিলেক দণ্ড না দেখিলে হই যে পাগল পারা ॥
তোমারে না দেখলে পুত্র গলে দিবাম কাতি।
তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাতি ॥ (সেন, ১৯৯৫ : ১৮)

উল্লেখযোগ্য, সেকালে শ্বশুর বাড়িতে বউয়ের তেমন কোনো মর্যাদা ছিল না। বধূর ওপর পীড়ন-আশঙ্কায় বিবাহিতা মেয়ের মা-বাপ-ভাই-বোন সব সময় বর-পরিবারের সঙ্গে তোয়াজের ভাষায় ব্যবহার করত। নারী ছিল অসহায় ও স্বাধীনসত্তাবিহীন। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর, মাতারূপে সন্তানের আশ্রয়ে ও অভিভাবকত্বে জীবন কাটত মেয়েদের (শরীফ, ২০০৬ : ৩১)। এসব কারণেই পুত্র সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মাতার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয়।

প্রিয়জন বেড়াতে এলে বাংলাদেশের লোকসমাজে সেকালে বসার জন্য পিঁড়ি; আপ্যায়নে সালিধানের চিড়া, সবরি কলা, দুধ-দই, খিলিপান ইত্যাদি দেওয়া হতো। *মৈমনসিংহ গীতিকার* 'কমলা', 'চন্দ্রাবতী' প্রভৃতি পালাতে বাঙালি সংস্কৃতির এই উপাদান প্রকাশ পেয়েছে। সংস্কৃতির এ উপাদানরাশি বাঙালির চিরায়ত উত্তরাধিকার। কারণ সংস্কৃতির উৎস সন্ধান পূর্ব-পুরুষের গৌরবমণ্ডিত উত্তরাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে আপন কালকে সঞ্জীবিত করে তোলে (ইসলাম, ১৯৯৯ : ২)।

৪

এককালে, *মৈমনসিংহ-গীতিকা* সাহিত্য হিসাবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা সারা বাংলাদেশেই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিসাবে এ গীতিকাগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে (কোরায়শী, ১৯৮১ : ৩৯)। *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালাগুলো সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে জনবিচ্ছিন্ন কাহিনি হিসেবে গড়ে উঠেনি (কাওসার, ১৯৯০ : ১৭৫)। *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালাগানগুলিতে কেন্দ্রীয়ভাবে লোক-সংস্কৃতির উপাদান চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. চন্দ্রকুমার দে বর্তমান নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত আইথর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠশালা পর্যায়ের শিক্ষিত, দরিদ্র, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী স্বভাব-কবি চন্দ্রকুমার পল্লীগীতি-গাথা প্রেমিক ছিলেন। তিনি ২(দুই) টাকা বেতনে স্থানীয় কালিপুর জমিদারী সেরেস্তায় তহশিলদারের চাকরি করতেন। বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে খাজনা আদায়ের সময় গাথা গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতেন এবং লিখে নিতেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মৈমনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে প্রাচীন মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে-প্রবন্ধ, প্রখ্যাত গবেষক ও পল্লীগীতি সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেনের চোখে পড়ে। তিনি প্রবন্ধ পড়ে অভিভূত হন। 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার দীনেশচন্দ্র সেনের বন্ধু ছিলেন। কেদারনাথের মাধ্যমে দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দে-র সন্ধান পান। চন্দ্রকুমার দে-র শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অনটন ইত্যাদি বিষয় দীনেশচন্দ্র সেন অবগত হন এবং তাঁর চিকিৎসা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করেন। সেকালে, অনেক চেষ্টায় চন্দ্রকুমার দে-কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০ (সত্তর) টাকা বেতনে *মৈমনসিংহ-গীতিকা* সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করেন (সেন, ১৯৯৫ : খ ৪৩-৪৭)।

গ্রন্থপঞ্জি

অতুল সুর (১৯৯১)। *বাংলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি*। জ্যোৎস্নালোক, কলিকাতা

আহমদ শরীফ (২০০৬)। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯৯৫)। দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত), *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। প্রথম খণ্ড, গতিধারা সংস্করণ, বাংলাবাজার, ঢাকা

আবদুল খালেক (২০০৩)। *মৈমনসিংহ-গীতিকা জীবন ও শিল্প*। বিশ্ব ভবন, ঢাকা

ওয়াকিল আহমদ (২০০১)। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা। বাংলাবাজার, ঢাকা

খোন্দকার রিয়াজুল হক (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের উৎসব*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ক্ষেত্র গুপ্ত (২০০০)। *প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন*। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা

গোলাম সামদানী কোরায়শী (১৯৮১)। *সাহিত্য ও ঐতিহ্য*। মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা

দীনেশচন্দ্র সেন (সংকলিত) (১৯৯৫)। *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, গতিধারা সংস্করণ, বাংলাবাজার, ঢাকা

দুলাল চৌধুরী (সম্পা.) (২০০৪)। *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা

নীহারঞ্জন রায় (১৪০০)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ফাতেমা কাওসার (১৯৯০) : "ময়মনসিংহ গীতিকার জনজীবন" *সাহিত্য পত্রিকা*, চৌত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২) : *লোকপুরাণ জনসমাজ ও কথা শিল্প* : নান্দনিক, কাঁটাবন, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৯) : *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী* : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ [সম্পা.], তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মনোয়ারা খাতুন (২০০১) : *বাংলাদেশের লোক-সাহিত্যে সমাজ* : বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোঃ শহীদুর রহমান (২০০১) *বাংলা সাহিত্যে লোক ঐতিহ্যের প্রভাব* অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা

মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১৯৯৯) *আবহমান বাংলা* অন্য প্রকাশ, ঢাকা

রমেন্দ্রনাথ দাস (২০০৪) : *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* দুলাল চৌধুরী [সম্পাদক], আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা

সুকুমার সেন (১৯৯১) : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯৪) : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদিপর্ব)* শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম [সম্পাদক] (২০১৩) : *বাংলা পিডিয়া*, ৮ম ও ৯ম খণ্ড : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯০) : *ময়মনসিংহ গীতিকা জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য* : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা